# বিদ্যাসাগরের 'বর্ণমালা': স্বতন্ত্রতার অনন্য পাঠ

**সারসংক্ষেপ**

উনিশ শতক থেকে আধুনিক বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থার একটা পট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণমালা' প্রকাশিত হবার পূর্বে প্রায় ৭-৮টি বাংলা প্রাইমার প্রচলিত ছিল। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত 'বর্ণমালা' বিদ্যাসাগরের যুগান্তকারী প্রাইমার। গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংস্করণের মধ্য দিয়ে তিনি বর্ণমালাকে ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে যুগোপযোগী করে তোলেন। ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও নৈতিক শিক্ষার সুস্পষ্ট ছাপ এই গ্রন্থের দুই ভাগে প্রকাশ পেয়েছে। শিশু মনস্তত্ত্ব, মানসিক উন্নতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ জীবনবোধের পাঠ্য হলো ‘বর্ণমালা’।

**সূচক শব্দ :** প্রাথমিক শিক্ষা, ভাষাবিজ্ঞান, অন্যান্য প্রাইমার, বর্ণমালা, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, নৈতিকতা।

**লেখক**

**ড. শিমুল চন্দ্র সরকার**
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
sarkarshimul86@gmail.com

e-ISBN: 978-93-7020-770-7


**মূল প্রবন্ধ**

ঋকবেদের যুগে সংস্কৃত বর্ণমালার সংখ্যা ছিল ৬৪টি। পরবর্তীকালে এই বর্ণের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আরো পরবর্তীকালে কুটিল লিপি, জটিল লিপি, সিদ্ধ মাতৃকা লিপি হয়ে নবম-দশম শতাব্দীতে প্রাচীন বাংলা লিপি যখন আধুনিক বাংলায় এসে পৌঁছায় তখন সর্বমোট বর্ণমালার সংখ্যা ছিল ৫০ টি। এতে ছিল ১৬টি স্বরবর্ণ ও ৩৪ টি ব্যঞ্জনবর্ণ। ১৮৩৩ সালে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থে বাংলা বর্ণমালা প্রসঙ্গে রামমোহন রায় বলেছিলেন "৩৪ হলে (= ব্যঞ্জনে) এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত"। ১৬ টি স্বরবর্ণ ও ৩৪ টি ব্যঞ্জনবর্ণ হাতে নিয়েই বিদ্যাসাগর তার বিখ্যাত 'বর্ণমালা' গ্রন্থ নির্মাণ করতে বসেন।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্ত দেব প্রকাশিত বাঙ্গালা 'শিক্ষাগ্রন্থ'। ১৮৩০ সালে প্রকাশিত হল 'শিশুবোধক'। ১৮৩৬ সালে 'কলিকাতা ট্রাস্ট সোসাইটি' থেকে ছাপা হয়েছে 'বালকের প্রথম পড়িবার বহি'। ১৮৪০ সালে প্রকাশ পায় 'শিশুসেবধি'। ১৮৪৬ সালে 'স্কুল বুক সোসাইটি' থেকে প্রকাশ পায় 'বর্ণমালা'। হিন্দু কলেজের বাংলা পাঠশালার সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন দত্ত ১৮৫৪ সালে 'বর্ণমালা'-র প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৯ সালে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য রচনা করেন 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থটি।

বিদ্যাসাগর আমৃত্যু নিজেকে শিক্ষায় ব্রতী করেছিলেন। শিক্ষাই ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা ও তপস্যার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি বাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বে ছিলেন তখন থেকেই স্কুল শিক্ষার গোড়ার গলদকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি মানুষ অন্তত প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক। Hunter Commission ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে Higher Education Report পেশ করে। এই রিপোর্টে উচ্চশিক্ষায় নতুন কার্যাবলী যুক্ত হলেও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আসলে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কেউ ভাবিত নয়। আর বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সেই গোড়াতেই কুঠার হানলেন। তিনি সর্বতোভাবে নেমে পড়লেন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনে। লিখতে শুরু করলেন বর্ণপরিচয়ের দুটি খণ্ড।

১৮৫৫ সালের ১৩ ই এপ্রিল প্রকাশ পায় 'বর্ণপরিচয়' এর প্রথম ভাগ। বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে বলেছেন - "বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ (১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাস) প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি বর্ণমালা ষোলোস্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষায় দীর্ঘ 'ঋ' কার ও দীর্ঘ '৯' কারের প্রয়োগ নাই, এই নিমিত্ত, ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণ স্থলে, এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ পদের মধ্য অথবা পদের অন্তে থাকিলে ড়, ঢ়, য় হয়। ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহারা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া

e-ISBN: 978-93-7020-770-7


উল্লেখিত হওয়া উচিত, এই নিমিত্ত উহারাও স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ, এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনা স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"[১]

১৮৪৯ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত 'শিশুশিক্ষা' এবং ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর নির্মিত 'বর্ণপরিচয়' বাঙালির প্রাথমিক শিক্ষাকে এক আলাদা মাত্রায় উন্নীত করেছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' প্রকাশ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মদনমোহনের প্রবল বন্ধুত্ব ছিল। সেই সময়ে 'শিশুশিক্ষা' চারিদিকে প্রবল সাড়া ফেলেছিল। তারপর যখন বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' লিখলেন সেই বন্ধুত্বে ঘটল বিচ্ছেদ। 'শিশুশিক্ষা'র আংশিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছিল 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থে। যখন বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' লিখেছিলেন সেই বছর মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'র ১ম ভাগের ১০ম সংস্করণ, ২য় ভাগের সপ্তম সংস্করণ এবং ৩য় ভাগের ষষ্ঠ সংস্করণ। তবুও 'বর্ণপরিচয়'-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। সমালোচকদের কাছে মনে হয়েছে যে বিদ্যাসাগর হয়তো 'শিশুশিক্ষা'য় কিছুটা অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেছিলেন, তাই 'বর্ণপরিচয়'-এর মাধ্যমে তার সম্পূর্ণতা দান করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে লক্ষণীয় যে 'বর্ণপরিচয়'-এর দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশ 'শিশুশিক্ষা' থেকে গ্রহণ করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে 'বর্ণপরিচয়'-এর ৬২তম সংস্করণে নিষ্কাশিত করা হয়েছিল। এই নিষ্কাশন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়'-এর ৬২তম সংস্করণে উল্লেখ করলেন- “পুস্তকের শেষভাগে, শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।”

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মদনমোহনের তীব্র বন্ধুত্বের মতোই 'শিশুশিক্ষা'র সঙ্গে 'বর্ণপরিচয়'-এর গভীর সম্পর্ক লক্ষ্যণীয়। তবে একথা অকপটে স্বীকার্য যে 'শিশুশিক্ষা'র কাছে 'বর্ণপরিচয়' যথেষ্টই ঋণী ছিল, এ কথা প্রমাণিত। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ১৮৪৯ সালে রচিত 'শিশুশিক্ষা' যেমন বাংলা প্রাইমারের পালাবদলের সূত্রপাত, তেমনি ১৮৫৫ সালে রচিত 'বর্ণপরিচয়' বাংলা প্রাইমারের মাইলস্টোন। "বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' এবং মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'র মধ্যে বর্ণের বিশ্লেষণ ও পরিচয়, অন্তর্ভুক্ত বিষয় বিশ্লেষণ ও বাক্যগঠন, ব্যবহৃত চরিত্র প্রভৃতির বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও 'শিশুশিক্ষা' ও 'বর্ণপরিচয়' দুটি বইয়ের ক্রমাগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ফলে একে অপরের নিকটে-দূরে, আসা-যাওয়ার বন্ধনে আবদ্ধ।"[২]- ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর বাঙালিকে এক গদ্যকারের প্রাইমার উপহার দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের পূর্বে যারা বাংলা প্রাইমার নির্মাণ করেছেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই সংস্কৃত বর্ণমালাকে অনুসরণ করে বাংলা বর্ণমালা নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সেই সারির লোক নন, তিনি ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে সংস্কৃত বর্ণমালাকে সরাসরি অনুসরণ না করে নতুন ভাবে বাংলা বর্ণমালা নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রখ্যাত ভাষাবিদ পবিত্র সরকার "বর্ণমালা : বিদ্যাসাগর, নতুন প্রস্তাব" নামে একটি প্রবন্ধে নতুন কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছেন। সেইসঙ্গে বিদ্যাসাগর বর্ণমালায় মূল কি কি পরিবর্তন করেছিলেন তা উল্লেখ করেছেন। "বিদ্যাসাগরই প্রথম সংস্কৃত বর্ণবিন্যাসের অন্ধ অনুসরণ না করে, তার সঙ্গে যোগ, বর্জন এবং পুনঃসংস্থান - এই তিন উপায়েই তার পরিবর্তন সাধন করলেন। নতুন বর্ণ যে তিনি উদ্ভাবন করেছেন তা নয়। ড়, ঢ়, য়, ৎ - এই চারটি বর্ণই বাংলা পুঁথিতে ব্যবহৃত হত, তিনি তাদের বর্ণমালায় স্থান করে দিয়েছেন; ৎ-এর ক্ষেত্রে তাঁরই ইঙ্গিতে পরবর্তীকালে তা বর্ণমালার বর্ণরূপে স্থান পেয়েছে।

e-ISBN: 978-93-7020-770-7


এক্ষেত্রে লিপি বর্ণমালাকে প্রভাবিত করেছে বলতে পারি। হ্যালহেডে 'র'-এর তিনটি চেহারাই ছিল-ব, র এবং ব। পরবর্তীকালে মুদ্রণে রামমোহনের সময়েই 'র' প্রায় একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা পায়। হ্যালহেডে 'ড়' এবং খন্ড ত এরও প্রয়োগ লক্ষ করি আমরা। ফলে ঈশ্বরচন্দ্র নতুন বর্ণ সৃষ্টি করেছিলেন, একথা ঠিক বলা যাবে না। তিনি বর্ণমালার ক্ষেত্রে যা করেছিলেন তা এই :

১. বর্জন : দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ঌকার।
যুক্তি : বানানে ('প্রয়োগে') অপ্রচলন।
ক্ষ-বর্জন। যুক্তি : উচ্চারণ ও সংগঠন।

২. স্থানান্তরণ : অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বরবর্ণের শেষ থেকে উঠিয়ে এনে ব্যঞ্জন তালিকার শেষে স্থাপন।
যুক্তি: উচ্চারণ।

৩. সংযোজন: চন্দ্রবিন্দুকে, ব্যঞ্জনের সর্বশেষে স্থাপন; ড়, ঢ়, য়-কে উষ্মধ্বনির পরে। যুক্তি: উচ্চারণ। এগুলির উচ্চারণ ড, ঢ, য থেকে পৃথক।

বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলা বর্ণমালা এখনকার চেনা চেহারা লাভ করল। বলা বাহুল্য, এই বর্ণমালাই এখন আমাদের কাছে স্বীকৃত ও গৃহীত।"[৩]

বর্ণপরিচয়-এর প্রথম ভাগের ষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে আছে, "আবশ্যক বোধ হওয়াতে এই সংস্করণে কোনো কোনো অংশ পরিবর্তিত হইয়াছে, সুতরাং সেই সেই অংশে পূর্বতন সংস্করণের সহিত অনেক বৈলক্ষণ লক্ষিত হইবে।" দ্বিতীয় ভাগের দ্বিষষ্ঠিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে, "এই সংস্করণে কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত ও চারটী নূতন নূতন পাঠ সংকলিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় এর আদর্শ ছিল লিন্ডলে মারে প্রণীত স্পেলিং বুক। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে এই ইংরেজি আদর্শ অনুসরণ করা অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। অবশ্য বর্ণপরিচয়-এর স্বাধীন চিন্তা বা স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণও সুস্পষ্ট। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্রের মতো ব্যাকরণবিদ ও ভাষাশিল্পীর পক্ষে তার অন্যথা হওয়াই অপ্রত্যাশিত ছিল। ... ইংরেজি আদর্শকে যথাযথ ভাবে বাঙলার উপযোগী করে নতুন রূপ দেওয়াতেই ঈশ্বরচন্দ্রের আসল কৃতিত্ব আর এইখানেই নিহিত রয়েছে বর্ণপরিচয়ের অভূতপূর্ব সাফল্য ও জনপ্রিয়তার কারণ।"[৪]

বর্ণপরিচয় রচিত হওয়ার আগে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি ও বর্ণমালাকে অনুসরণ করে ষোলটি স্বরবর্ণ ও চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল। বাংলা ভাষায় যে সব ধ্বনি সাধারণত উচ্চারিত হতো না, তাও আমাদের শিখতে হতো। বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করে বারোটি স্বরবর্ণ প্রযুক্ত করেন। বাংলা দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ঌ(লি) কারের প্রয়োগ না থাকার জন্য তিনি এই দুই বর্ণকে বহিষ্কার করেন। ঋণ ও ঋষির জন্য তিনি ঋ-কে বাদ দিতে পারেননি। কিন্তু ঌ(লি)-কে বাদ দিলেন না। ঌ-কে রেখে দিয়ে লিখলেন 'লিচু'। বর্ণপরিচয়-এ ব্যঞ্জনবর্ণ ক থেকে হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ পর্যন্ত সংখ্যা চল্লিশটি। প্রথম ভাগের বর্ণযোজনার ঈষৎ,

জগৎ শব্দের মধ্যে তিনি ৎ-এর প্রয়োগ করেন। বর্ণপরিচয়-এ হলন্ত পাওয়া যায় না। যথা সত্, জগত্, ঈষত্, চিত্কার, চকচক্, ধক্ ইত্যাদি। বর্ণপরিচয়-এর নির্দেশ অনুসারে প্রথম চারটি শব্দ সৎ, জগৎ, ঈষৎ, চিৎকার লেখা হওয়া উচিত। কিন্তু চক্ চক্, ধক্ ধক্, বক্ বক্ বা আরও এরকম শব্দ লেখার জন্য বর্ণপরিচয়-এ কোনও নির্দেশ দেওয়া নেই। বইতে কিন্তু হসন্ত চিহ্নের ব্যবহার না থাকলেও হসন্ত-এর উচ্চারণ আছে। প্রথম ভাগের ৬০তম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "সকল শব্দের অন্ত্যবর্ণে আ, ই, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হসন্ত, কতকগুলি আকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা হসন্ত কর, খল, ঘট, জল, রস, বন ইত্যাদি। আকারান্ত ছোট, বড়, জল, ঘৃত, তৃণ, মৃগ ইত্যাদি, কিন্তু অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণের অনুসরণ না করিয়া তাদৃশ্য শব্দ মাত্রেই অকারান্ত উচ্চারিত হয়ে থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে, তন্মধ্যে যেগুলি অকারান্ত উচ্চারিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশে এইরূপ চিহ্ন যোজিত হয়। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হসন্ত উচ্চারিত হইবে।" বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়-এ প্রথমে বর্ণমালার মধ্যে খণ্ড ত-কার চিহ্নের উল্লেখ করেননি। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে খণ্ড ত-কার দিয়ে কোনও শব্দের উদাহরণ দেননি। প্রথম ভাগের ৬০তম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন, "বাংলা ভাষায় ত-কারের ত, ৎ এই বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে; দ্বিতীয় কলেবরের খণ্ড ত-কার ঈষৎ, জগৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ড ত-কার ব্যবহার হইয়া থাকে। খণ্ড ত-কারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষ ভাগে ত-কারের দুই কলেবর প্রকাশিত হইল।'

বর্ণপরিচয় দুই ভাগে বিভক্ত দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। বর্ণপরিচয়-এর প্রথম ভাগ যেভাবে সাজানো হয়েছে তা হলো, বর্ণযোজনা, আকার, ইকার, ঈকার, উকার, ঊকার, ঋকার, একার, ঐকার, ওকার, ঔকার, যোগ, মিশ্র উদাহরণ, অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু যোগ, বর্ণ বিশেষে উ, ঊ, ঋ যোগে। এর পরে প্রথম পাঠ থেকে একুশ পাঠ। এছাড়া প্রত্যেক যোগের উদাহরণ এবং পরীক্ষা এতে যুক্ত করা হয়েছে।

বর্ণপরিচয়-এর দ্বিতীয় ভাগে য, র, ল, ব, ণ, ন, ম-ফলা, রেফের পরে দুই অক্ষরে ও তিন অক্ষরে মিশ্র সংযোগ শব্দ স্থান লাভ করেছে। এর সঙ্গে প্রথম পাঠ থেকে দশম পাঠ যুক্ত হয়েছে।

বর্ণপরিচয়-এর পাঠে অনুস্বার যোগ আছে - অংশ, বংশ, হংস, মাংস, সিংহ, দংশন, সংশয়, সংযোগ, সংসার, বিংশতি, মীমাংসা।

বর্ণপরিচয়-এ এ-কার যোগের উদাহরণ - কেশ, খেদ, তেজ, দেশ, ভেক, মেঘ, বেশ, শেষ, সেবক, আদেশ, অনেক, অপেয়, অভেদ, আবেশ, অশেষ।

এবার বর্ণপরিচয়-এর দ্বিতীয় ভাগ থেকে র-ফলার উদাহরণ বক্র, বিক্রয়, ক্রুর, ক্রোধ, অগ্র, গ্রহণ, গ্রাম, অগ্রিম, শীঘ্র, ঘ্রাণ, আঘ্রাণ, বজ্রপাত, পাত্র, মিত্র, ত্রাস, কৃত্রিম, রৌদ্র, নিদ্রা, হরিদ্রা, মুদ্রিত, গৃত্র, প্রিয়মান, প্রণয়, প্রাণ, প্রীতি, প্রেরণ, শুভ্র, ভ্রমণ, ভ্রাতা, ভ্রূকুটি, আম্র, তাম্র, নম্র, সম্রাট, ব্রণ, ব্রত, ক্রীড়া, শ্রম, বিশ্রাম, আশ্রিত, শ্রীমান, সহস্র, সংস্রব, স্রাব, স্রোত, হ্রদ, হ্রাস, হ্রিয়মান ইত্যাদি।

e-ISBN: 978-93-7020-770-7


১৮৭১ সালে 'Christian Vernacular Education Society'র অন্যতম কর্তাব্যক্তি রেভারেন্ড জন মার্ডক একটি বই লেখেন- 'On the reading books chiefly used in Mission Schools in Bengal', তাতেই বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রসঙ্গে মার্ডকের অভিযোগ - 'In the 67 pages which they contain, there does not seem to be a single allusion to God or a future State'। ঈশ্বর নয়, জাগতিক মঙ্গলই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষাচিন্তার ভিত্তি। "বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণপরিচয়' এবং 'বোধোদয়' শিশুপাঠ্য হিসেবে তদানীন্তন বাংলার সব স্কুলেই পড়ানো হত। মিশনারি স্কুলগুলিও এই বইদুটি তাদের পাঠ্যসূচিতে রেখেছিল। কিন্তু ইংরেজ পাদরি জন মার্ডক (১৮১৯-১৯০৪) বইদুটির কিছু 'গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি' চিহ্নিত করে মিশনারি স্কুলে বইগুলি পড়ানোর তীব্র বিরোধিতা করেন। মার্ডকের অভিযোগ ছিল বিদ্যাসাগরের বই দুটি 'নিম্নমানের হীন নীতিশিক্ষা'র (low miserable morality) বই। তিনি এও বলেন, বইগুলি 'চূড়ান্ত বস্তুবাদ' (rank materialism) শেখানোর উদ্দেশ্যেই রচিত। তবে কিছুটা উদার মনোভাবাপন্ন হওয়ার কারণেই হয়ত খ্রিস্টান মিশনারি ইন্টেলিজেন্সার পত্রিকার মিশনারিরা মার্ডকের অভিযোগগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি। তাঁদের বক্তব্য ছিল, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইতে ধর্মশিক্ষা নিয়ে এরকম 'ত্রুটি' ধরা অপ্রয়োজনীয়। তাঁদের এই মন্তব্য মার্ডককে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে। তিনি খ্রিস্টান মিশনারি ইন্টেলিজেন্সার পত্রিকার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের বইগুলির সমালোচনা সহ আরেকটি রিপোর্ট লেখেন। মার্ডকের সেই রিপোর্টের একটি অংশ ইন্দ্রমিত্র রচিত 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর'-এ (১৯৯২, পৃ. ৭১৮-৭২১) সংকলিত হয়েছে। মার্ডকের মূল লেখাটি তাঁর Education as a Missionary Agency in India (Madras, 1872) নামক ইংরেজি গ্রন্থের অন্তর্গত। মার্ডকের রিপোর্টটি খুঁটিয়ে বিচার করলে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের ধর্ম ও দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গির একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।"[৫]

১৮৫৭ সালে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের ষষ্ঠতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর আরও বেশ কিছু বছর জীবিত থাকলেও আর কোনরূপ বর্ণপরিচয়ের সংস্করণ প্রকাশ করেননি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর (১৮৯১) পাঁচ বছর পরে ১৮৯৬ সালে পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বর্ণপরিচয়ের আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেই সংস্করণে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় এর অপ্রচলিত 'তৎসম শব্দ'গুলি বর্জন করেন। তার পরিবর্তে নতুন শব্দ সংযোজন করেন। শিশু পাঠ্যপুস্তক 'বর্ণপরিচয়' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমরকীর্তি। 'বর্ণপরিচয়' শুধুমাত্র বর্ণের পরিচয় নয়, সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার পরিচায়ক।

বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগে বিদ্যাসাগর কয়েকটি বিষয়কে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন - দুই অক্ষরের মিশ্র শব্দ-'পূজা', 'ধেনু', 'শিখা'। তিন অক্ষরের মিশ্র শব্দ-'বিকার', 'আকৃতি', 'কোকিল', চার অক্ষরের মিশ্র শব্দ- 'অধিকার', 'অনুপায়', 'পরিণাম', পাঁচ অক্ষরের মিশ্র শব্দ- 'অনুধাবন', 'অনুমোদন', 'পরিবেশন' ইত্যাদি অক্ষরের ব্যবহার দেখিয়েছেন। অনুস্বার যোগে শব্দের ব্যবহার যেমন-'অংশ', 'মাংস', 'সিংহ'। বিসর্গ যোগে শব্দের ব্যবহার 'দুঃখ', 'অতঃপর', দুঃসময়'। চন্দ্রবিন্দু যোগে শব্দের ব্যবহার 'খাঁচা', 'কাঁপা', 'ফাঁপা'। শিশুমনের উপযোগী বর্ণশিক্ষা বানান ও শব্দশিক্ষা একাধিক শব্দের দ্বারা সরল বাক্য তৈরি, সরল বাক্য থেকে মিশ্র ও যৌগিক বাক্য এবং বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ রচনা করে তিনি শিশুশিক্ষার এক নতুন পদ্ধতি তৈরি করেন।

e-ISBN: 978-93-7020-770-7


বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ প্রকাশের অল্প কয়েক মাস পরে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫) প্রকাশিত হয়। এখানে প্রধানত যুক্ত ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্তগুলি দেখানো হয়েছে। "বালকদিগের সংযুক্ত বর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণ বিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত প্রয়াস পাইবেন না, বর্ণ বিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে গুরু-শিষ্য উভয় পক্ষের বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক এবং শিক্ষা বিষয়ে ও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।"[৬]

বর্ণ পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে দশটি পাঠ সংযোজিত হয়েছে। প্রথমে তিনি যুক্ত ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তারপর একটি পাঠ সংযুক্ত করে তাতে উক্ত যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার করেছেন। "ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণ বিভাগ-শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নিরস বোধ হইবেক এবং বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক-এক পাঠ দেওয়া হইয়াছে।" বর্ণ সংযোগের যত রকম 'Permutation Combination' ব্যাকরণ ও অভিধানে স্বীকৃত হয়েছে, বিদ্যাসাগর অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।[৭]

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের যুক্তাক্ষর রীতি বড়ই চিত্তাকর্ষক। প্রথমে ছোট ছোট শব্দ দিয়ে শুরু করে ক্রমে ক্রমে জটিল শব্দের ব্যবহার বাড়িয়েছেন। 'য' ফলা এর ব্যবহার লেখ্য 'ঐক্য', 'বাক্য', 'যোগ্য' র-ফলা এর ব্যবহার 'শীঘ্র', 'ঘ্রাণ', 'বজ্রাঘাত' ল ফলা এর ব্যবহার 'পল্লব', 'আহ্লাদ', 'শ্লেষ' এর ব্যবহার 'পক্ক', 'জ্বালা', 'দিজ' এর ব্যবহার ভগ্ন মগ্ন আগুনের ব্যবহার আত্ম যুক্তব্যঞ্জন এর ব্যবহার করে। শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয় এর মধ্যে একটা আলাদা স্থান অধিকার করে আছে। বর্ণপরিচয় এর দ্বিতীয় ভাগে রেফ এর ব্যবহার করেছেন সেগুলির মধ্যে যেমন 'তর্ক', 'কর্কশ', 'মূর্খ'। মিশ্র সংযোগ ঘটিয়ে এমন বর্ণনায় তৈরি করেছিলেন যেমন 'চিক্কণ', 'বিশৃঙ্খলা', 'আজ্ঞা', 'কষ্ট', 'হস্ত', 'পরস্পর' প্রভৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।[৮]

বিদ্যাসাগর মহাশয় যুক্তিবাদী ভাষাবিজ্ঞানের মতন বাংলা ভাষার উচ্চারণ ও ব্যবহারে তিনি গভীর মনোযোগী ছিলেন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলা ভাষা সরলীকরণে যে কথা বলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল পূর্বেই তা শুরু করেছিলেন বর্ণপরিচয় (১৮৫৫) তাই প্রমাণ করে। তার জীবনের জপ-তপ-ধ্যান ছিল মাতৃভাষা। বাংলা ভাষার গোড়া যাতে মজবুত হয়, ভিত যাতে দৃঢ় হয় এবং টবের সৌখিন ফুলের মতন মনোহর রূপ নিয়ে ফুটে উঠে যাতে তা না ঝরে যায়, তাই ছিল তার লক্ষ্য। দেশীয় ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যের প্রাণ রসে সঞ্জীবিত হয়ে যাতে সেই ভাষা বিদেশী জ্ঞান ভান্ডার থেকে সমস্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবানুবাদের প্রকৃত বাহন হয়ে ওঠার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষভাবে আবেদন করেছেন।[৯]

বিদ্যাসাগরের গভীর মননশীলতা, শিশু মনস্তত্ত্বের গভীর জ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের দখলদায়িত্বের কারণে বইটির দুটি খণ্ড অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তিনি শিশুদের সুবিধার্থে অক্ষর পরিচয়ের জন্য যুক্তাক্ষর শিক্ষণের পর একটি পাঠ সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। বর্ণপরিচয় গ্রন্থে পাপাচার, ইহকাল, পরকালের পাঠ আর থাকলো না। দেওয়া হল জীবনের মূল্যবোধের পাঠ। পুরো বইটিতে রাখা হয়েছে সামাজিক হিতবাদের ও জীবনাচারণের মূল্যবান পরামর্শ। আবার যেমন দ্বিতীয় ভাগের বিভিন্ন জায়গায় পাচ্ছি - "সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয় সকলে তাহাকে ভালোবাসে। যে মিথ্যা কথা কয় কেহ তাহাকে ভালবাসে না,

e-ISBN: 978-93-7020-770-7


সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। কখনো কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না।"[১০] বর্ণমালা ও শিশুশিক্ষা গ্রন্থের মত স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্যের কথা এই গ্রন্থে কোথাও আলোচিত হয়নি। এখানেই বিদ্যাসাগর স্বতন্ত্র। বিদ্যাসাগরের সমাজ চিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিফলনে এই গ্রন্থে লক্ষণীয়। বইটির কোথাও ধর্ম, জাতি, বর্ণভেদের নিমিত্ত মাত্র উল্লেখ নেই। জাতপাত বর্ণের ঊর্ধ্বে এমন অসাম্প্রদায়িক পাঠ্য শিশু মনের কোমল দিকগুলোকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তোলে। যেমনি স্বতন্ত্র বিদ্যাসাগর তেমনি স্বতন্ত্র বর্ণপরিচয়।

## তথ্যসূত্র

১. বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৩২, পৃষ্ঠা - ১৫-২২।
২. বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' ও অন্যান্য প্রাইমার : একটি আলোচনা, সুকান্ত কুমার পাত্র, শুভকরী পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন, সম্পাদনা, ড. মলি ঘোষ, কলকাতা, ২০২০, পৃষ্ঠা - ৩৪৫-৪৬।
৩. "বর্ণমালা : বিদ্যাসাগর, নতুন প্রস্তাব, পবিত্র সরকার, শুভকরী পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন, সম্পাদনা, ড. মলি ঘোষ, কলকাতা, ২০২০, পৃষ্ঠা - ১৬৮-৬৯।
৪. বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৩২, পৃষ্ঠা - ১৫-২২।
৫. 'বর্ণপরিচয়' ও 'বোধোদয়' সম্পর্কে জন মার্ডক-এর রিপোর্ট, সম্পাদকমণ্ডলী, সংবর্তক, জন্মদ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক সৌরভ রঞ্জন ঘোষ, ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২০, ISSN : 2582-0893, পৃষ্ঠা – ৬৫৭।
৬. বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৩৩, পৃষ্ঠা - ১৩-২১।
৭. দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ে বর্ণপরিচয়, তমাল কান্তি পাল, দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর স্মরণ সংখ্যা, সম্পাদক নাজিবুল ইসলাম মন্ডল, সমকালের জিয়ন কাঠি প্রকাশন, ২০২০, ISSN : 2249-4782, পৃষ্ঠা - ১৮৬-৮৭।
৮. বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় আমাদের বিনম্র ঋণ স্বীকার, রাজু মন্ডল, দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর স্মরণ সংখ্যা, সম্পাদক নাজিবুল ইসলাম মন্ডল, সমকালের জিয়ন কাঠি প্রকাশন, ২০২০, ISSN : 2249-4782, পৃষ্ঠা - ২০৮-০৯।
৯. 'বর্ণপরিচয়' -এর বিদ্যাসাগর, নির্মাল্য কুমার ঘোষ, দ্বিশতজন্মবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র, কোরক, সম্পাদক তাপস ভৌমিক, শারদীয় ২০১৯, পৃষ্ঠা - ১১২।
১০. 'বর্ণপরিচয়' ও 'বর্ণবোধ' একটি তুলনামূলক আলোচনা, কৃষ্ণচন্দ্র ভূঁইয়া, দ্বিশতজন্মবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র, কোরক, সম্পাদক তাপস ভৌমিক, শারদীয় ২০১৯, পৃষ্ঠা - ২৯২-২৯৫।

## গ্রন্থপঞ্জি

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮
২. খাস্তগীর ,আশিস সম্পাদিত, বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, কলকাতা, ২০০৬
৩. ভট্টাচার্য, উৎপল সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিতীর্থ, কলকাতা, ২০১৮
৪. বসু, স্বপন, সমকালে বিদ্যাসাগর, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৩
৫. বদরুদ্দীন, উমর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, কলকাতা, ২০০১
৬. কর, আবির সম্পাদিত, উনিশ শতকের বিস্মৃত বাংলা প্রাইমার, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, ১৪২০